আল মাহী-উল-মুলক

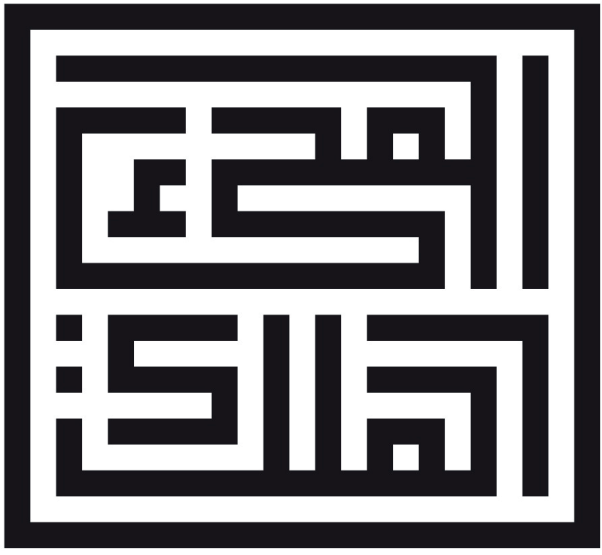

আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াদুদ

ইলাননূর পাবলিকেশন

আল মাহী-উল-মুলক

সর্বস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: শেখ নাসিম উদ্দিন
সম্পাদনা ও শরয়ী নিরীক্ষণ: মাওলানা সালমান মোহাম্মদ
বানান ও ভাষারীতি: মাকামে মাহমুদ
আরবি ক্যালিগ্রাফি: সাজু তাওহীদ
কুফি ক্যালিগ্রাফি: ইব্রাহীম মাহী

প্রথম প্রকাশকাল
জুন ২০২৫; জিলহাজ্জ ১৪৪৬

ISBN: 978-984-99357-0-4

মূল্য: ৮০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করাও অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

ইলাননূর পাবলিকেশন
দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮০ ১৪০৭ ০৭০২৬৬-৬৯
ওয়েব: www.ilannoor.com; **ইমেইল:** publication.ilannoor@gmail.com

‘সন্তানের পক্ষ থেকে প্রিয় পিতামাতার
প্রতি আমার বিনম্র নজরানা’

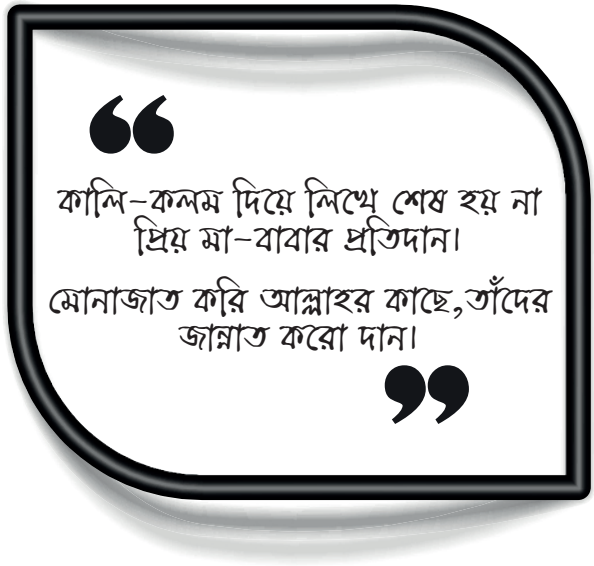

প্রকাশকের বার্তা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ইলাননূর পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হলো লেখক জনাব আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদুদ-এর রচিত মহানবীর জীবনীভিত্তিক অসাধারণ একটি আলোচনা গ্রন্থ—"আল মাহী-উল-মুলক"।

আখেরি নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পবিত্র জীবন মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। এই বইটিতে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সহজ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটি সাজানো হয়েছে নবীজির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনের যোগসূত্রতা, নবুয়তের সত্যতা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, সাহাবিদের মহান অবদান এবং নবীজির জীবনের বিদায়ী মুহূর্তসহ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বিভক্ত করে।

আশা করি গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পাঠকদের অন্তরে নবীজির প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর সীরাত অনুসরণের প্রতি অনুপ্রেরণা তৈরি হবে, ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত লেখক অত্যন্ত যত্নের সাথে বইটি রচনা করেছেন, যা নবীজির জীবনের গভীরতা উপলব্ধি ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার জন্য সহায়ক হবে।

নবীর জীবনীভিত্তিক বিভিন্ন প্রবন্ধের পাশাপাশি নবী ও সাহাবিদেরকে নিয়ে অনেকগুলো পদ্য কবিতাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, যা বইটিকে একটি অনুপম ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আমাদের বিশ্বাস, বইটি বাংলাভাষী সকল পাঠকদের জন্য নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সীরাত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ লেখকের এই মূল্যবান প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং পাঠকদের জীবনে বইটির কল্যাণ ও প্রসার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিন—আমীন।

এ কে এম আহ্সান হাবীব
ইলাননূর পাবলিকেশন ঢাকা, বাংলাদেশ।

আল মাহী-উল-মূলক

ইলাননূর পাবলিকেশন

মায়ের কলম

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন উম্মে হোসাইন ফাতিমা বেগম। নাম শুনে সহজেই বোঝা যায়, কাকে অনুসরণ করে তিনি আমার এই নামটি রেখেছেন।আমার জন্ম নিয়ে মজার একটি গল্প আমাদের পরিবারে প্রচলিত আছে। ফজরের ওয়াক্তে, আমি যখন পৃথিবীতে আগমন করি, আমার মা তখন আতুর ঘরে ছিলেন। আর আমার বাবা অন্য একটি ঘরে সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন। নামাজ ও দোয়ার একপর্যায়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেখেন, কেউ যেন তাকে বলছে, 'এই উঠো, তোমার ঘরে মা ফাতেমা এসেছে।' ঠিক সে সময়ে আমার জন্ম হয়। একজন আমাকে কোলে নিয়ে বাবাকে ডেকে বলে, 'দেখেন, আপনার একটি কন্যা সন্তান হয়েছে।' তখনই আমার নাম রাখা হয় 'ফাতিমা'।

আমার পিতার মোট বারজন সন্তান—ছয় ছেলে এবং ছয় মেয়ে। আমাদের প্রত্যেক ভাইবোনের নামই নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সুন্দরভাবে সংশ্লিষ্ট। যেমন, আমার বড় দুই ভাইয়ের নাম—আবুল কাসেম মুহাম্মদ মাহবুবুল ইসলাম এবং আবুল বাসার মুহাম্মদ মাসউদ। আমার বড় আরেক বোনের নাম উম্মে সালমা জয়নব বেগম। তেমনিভাবে বাকি ভাইবোনদের নামেও নবীজির নামের ছোঁয়া ও ঐতিহ্য সমানভাবে বজায় রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। নাম রাখার এই নির্দিষ্ট ধরন দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমার পিতার চিন্তা-চেতনায়, বিশ্বাসে ও জীবনদৃষ্টিতে রাসূল (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত ছিলো । কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায়, মাত্র দশ বছর বয়সেই আমি আমাদের পিতাকে হারাই; তিনি ১৯৫১ সালে ইন্তেকাল করেন।

আজ বহু বছর পর, আমার প্রিয় ছোট সন্তান যখন তার পরিণত বয়সে রাসূল (সা.)-কে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তখন আমার মনে হচ্ছে, এটি আমার পিতার নবীর প্রতি ভালোবাসার সেই ঐতিহ্যেরই এক অনন্য ধারাবাহিকতা, আলহামদুলিল্লাহ।আখেরি নবীর উম্মত হিসেবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাদের সবার হৃদয়েই সকল সময়ে সজীব। আমাদের পিতা যেমন আমাদের সেই মহান নবীর আদর্শে গড়ে তুলেছেন, তেমনি আমিও চেষ্টা করেছি আমার সন্তানদেরকে সেই ধারাবাহিকতায় গড়ে তুলতে।

তবে, নবীর প্রতি ভালোবাসা বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ করে, তার রুচি, শিক্ষা, মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী এবং সেটাই স্বাভাবিক।একজন মাতা হিসেবে, আমার সন্তানের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের এই মুহূর্তে আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত—বিশেষ করে যখন এটি এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে রচিত।

এই বিশেষ দিনে, অন্তরের গভীর থেকে এই দোয়াই করি—মহান আল্লাহ যেন কিয়ামতের দিনে আমার পিতা-মাতা, আমার পরিবার ও সন্তানসহ সকলকে আখেরি নবীর উম্মাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের মর্যাদা আসীন করেন। আমীন।পরিশেষে এই বই —"আল মাহী উল মুলক"—এর সর্বাত্মক সাফল্য, প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। আল্লাহ আমার সন্তানের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

আবদুল্লাহর মা
উম্মে হোসাইন ফাতেমা বেগম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

নিজের কৈফিয়ত

আমি কোনো কবি, লেখক বা সাহিত্যিক নই। আমি মাদরাসায় পড়াশোনা করা কোনো ছাত্র বা আলেমও নই। আমার নেই ইসলাম নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা বা এই সম্পর্কিত কোনো ডিগ্রি। আমি অত্যন্ত সাধারণ একজন মুসলিম এবং শেষ নবীর উম্মতের দাবিদার হিসেবে আল্লাহর এক নগণ্য বান্দা।

আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি, ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে চলার চেষ্টা করি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আমাদের হৃৎস্পন্দনের মতো সার্বক্ষণিক একটি বিষয়, নবীর প্রতি ভালোবাসা আমাদের জীবনের মূল শক্তি। আমরা ঈমানকে সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসেবে দেখি, নবীর উম্মত হওয়াকে সবচেয়ে গৌরবময় বলে মনে করি এবং পরকালে জান্নাতপ্রাপ্তিকে মানবজীবনের চূড়ান্ত সফলতা হিসেবে বিশ্বাস করি। নবী আমাদের পথের আলো, মাথার মুকুট, চোখের শিরোমণি, আবেগ ও ভালোবাসার কেন্দ্র এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের সকলের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এক অনুপম আদর্শ।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের বই পড়েছি, পড়াশোনা করেছি এবং জগদ্বিখ্যাত আলেম ও স্কলারদের অনেক লেকচার শুনেছি। এভাবে নবীর পবিত্র জীবন সম্পর্কে কিছুটা জানার সুযোগ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের প্রতি—সকল শিক্ষক ও উস্তাদদের প্রতি, যাদের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেছি। এই সকল উস্তাদ ও শিক্ষকদের মাধ্যমে নিজে যা জেনেছি এবং উপলব্ধি করেছি, সময়ের বাস্তবতায় বিভিন্ন সময়ে নিজের জ্ঞান ও ধারণা মোতাবেক তা লিখেছি।

এ বইটি তারই একটি সংকলন মাত্র। শুধুমাত্র লেখার তাগিদ থেকেই এই বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি, যেন কাল-কিয়ামতে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারি

এবং কৈফিয়ত দেবার সুযোগ পেতে পারি, যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন, বান্দা তার মেধা, যোগ্যতা ও সময় দুনিয়াতে কোন কাজে ব্যয় করেছে। কিয়ামতের সেই কঠিন দিনে আমার এই প্রচেষ্টা ও লেখাগুলো যেন তার একটি উত্তম উসিলা হয়। আল্লাহ আমাদের নেক নিয়ত ও আমল কবুল করুন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমরা তাদের নিজেদের সমাজ ও জীবন থেকে দ্বীন ইসলামকে দিনে দিনে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। নবীর পবিত্র জীবন তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে মুসলিম সমাজে বিজাতীয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধ্যানধারণা এবং তাদের মতবাদগুলো দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। নবীর জীবনে একদিন উমর (রা.) নবী ﷺ-এর সামনে তাওরাত থেকে কিছু পাঠ করছিলেন, তখন নবী ﷺ-এর পবিত্র চেহারা রক্তিম লাল হয়ে যায়। তিনি ﷺ বলেন, কুরআন নাজিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও শরিয়তকে রহিত করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের ১৪০০ শত বছর পর আজ মুসলিমরা বিশ্বের সবচেয়ে হীন ও অপমানিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলামের আগমনের পর, নবীর আগমনের পর মুসলিমরা প্রতিষ্ঠা করেছিল দিগ্‌বিজয়ী এক উন্নত মানবসভ্যতা। কিন্তু আজ সেই নবীর উম্মতই পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্যাতিত ও অপমানিত একটি জাতি। আর এর একমাত্র কারণই হলো, সেই মহান নবীর আদর্শের পথ থেকে মুসলিমদের সরে আসা, তাঁর পবিত্র জীবনী না জানা, তা নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ না করা এবং তাঁর পবিত্র জীবন ও হিদায়াতের আলোকে মুসলিম সমাজ ও চরিত্র গঠন না করা।

নবীর প্রতি উম্মতের ভালোবাসা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এই জায়গা থেকে আমার লেখার ও বই প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ আমাদের নবীর জীবনকে জানার ও মানার তাওফিক দান করুন এবং খিলাফতের সোনালি ইতিহাসের মতন দ্বীন ইসলামকে মানবসভ্যতার সকল আদর্শ ও মতবাদের ওপর আবারো বিজয়ী করুন।

মূলত আল্লাহর প্রেরিত শেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন আমাদের জন্য অবশ্যপাঠ্য একটি বিষয়। আমরা যে মহান নবীর উম্মত, তাঁর জীবনী জানা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অবশ্যকর্তব্য—যার যার মেধা, যোগ্যতা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। আমরা দিনের

আলোতে যেমন সব কাজ করি, তেমনি মুসলিমদের জীবনে পথ চলার জন্য হিদায়াতের আলো হলো কুরআন। সেই কুরআন যে নবীর জীবনে নাজিল হয়েছে এবং যাঁর জীবনের ধারাবাহিকতায় কুরআন অল্প অল্প করে বর্ণিত হয়েছে, সেই নবীর জীবনী না জানা মুসলিমের জন্য মারাত্মক অন্যায়।

তবে এই বইটি ঠিক নবীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয় এবং তা আমার লেখার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যও নয়; বরং নবীর জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার আলোকে সাধারণ কিছু বিশ্লেষণ, অনেকটাই নিজের মতো করে এবং নিজস্ব উপলব্ধির আঙ্গিকে। আমাদের মনে রাখা উচিত, মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত শেষ নবীর জীবনকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যেন কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মত নবীর জীবন থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পায়। আখেরি নবীর জীবন আমাদের আর দশজনের মতো নিছক একটি সাধারণ জীবন নয়, বরং মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধায়নে রেখে এই নবীর জীবনকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতি সকলেই এই নবীর জীবনকে অনুসরণ করতে পারে এবং তাঁর মহান জীবন থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পায়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, বর্তমান সেক্যুলার ভাবধারায় সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় নবীর জীবন, নবীর আদর্শ এবং তাঁর আলোচনা অনেকটাই উপেক্ষিত; অথচ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নবীকে উপাধি দিয়েছেন 'উসওয়াতুন হাসানা' বা মানবজাতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে। যাঁর জীবনকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন তাঁর পাক-কালাম নাজিল করার জন্য, যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, যিনি সমস্ত নবীদের নেতা, যিনি আসমানেও সম্মানিত, যাঁর নামে আসমানের দরজা খুলে যায়, যাঁর নামে দুআ কবুল হয়, যাঁর শাফাআত ছাড়া কিয়ামতের দিন কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না—সেই নবীর জীবন থেকে, জীবনের শিক্ষা থেকে তাঁর উম্মত কীভাবে গাফিল থাকতে পারে?

সেই মহান নবীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে ও নবীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপলব্ধির আলোকে প্রবন্ধ আকারে আমার এই লেখাগুলো। এবং নবীর প্রতি নিজের আবেগ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কবিতার কিছু পঙক্তিমালা রচনা করেছি ও পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। দরুদ ও সালাম সেই মহান নবীর প্রতি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বই হিসেবে এটি আমার প্রথম প্রকাশ। মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, তাই এই বইটিতেও মানবীয়, অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। প্রিয় পাঠককে ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার অনুরোধ রইল। বইটিতে যা কিছু ভালো, তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ভুলের সব দায় আমার ওপর। বারবার নিরীক্ষণ সত্ত্বেও বইটিতে যদি কোনো ভুল চোখে পড়ে, বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে সবিনয় অনুরোধ তা ধরিয়ে দেবার জন্য।

বইটি প্রকাশে যারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আপনাদের এই ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া বইটি পাঠক পর্যন্ত পৌঁছানো আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান, মহান আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদুদ
ধানমন্ডি, ঢাকা
mahiulmulk@gmail.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

‘আমার বহু নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহমাদ (অত্যধিক প্রশংসাকারী), আমি আল-মাহী (বিলুপ্তকারী), যাঁর মাধ্যমে কুফর বিলুপ্ত হবে। আমি আল-হাশির (একত্রকারী), যাঁর পেছনে লোকদের সমবেত করা হবে। আমি আল-আকিব (সর্বশেষ), যাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। আর আল্লাহ আমাকে রউফ ও রাহীম (করুণাশীল ও অতি দয়ালু) নামে অভিহিত করেছেন।’

(সহীহ মুসলিম)

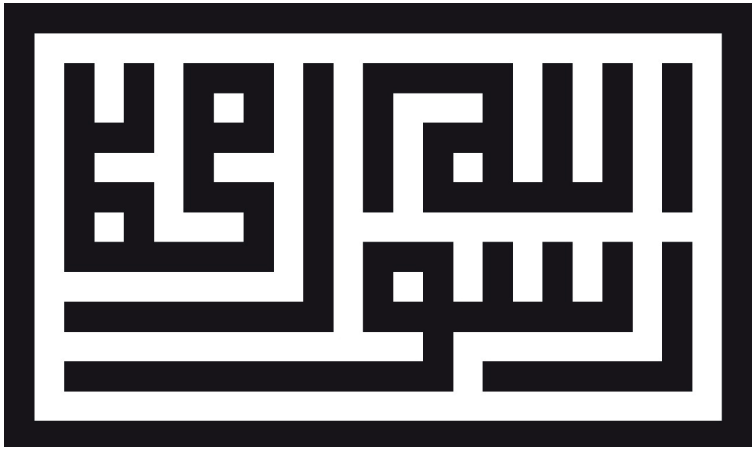

বুকের মাঝে নেই সাগরের গভীরতা, বুকে আছে নবীর প্রতি ভালোবাসা।
বিচারের দিনে পাবো প্রিয় রাসূলের শাফাআত, মনে আছে সেই প্রত্যাশা।

শিরোনাম বক্তব্য

আল মাহী-উল-মুলক (জগতের কুফর ও শিরক বিলুপ্তকারী)

'লা-ইলাহা' অর্থ "নেই কোন ইলাহ" একটি নবুয়তি, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক মিশন, আর সেই মিশনের পূর্ণতা, জবাব ও সমাধান হলো ইল্লাল্লাহ, অর্থ আল্লাহ ছাড়া। তাই "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর পুরো অর্থ, নেই কোন ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া। প্রতিটি মিশনের যেমন বাহক থাকে, তেমনি আল্লাহর মনোনীত নবীরা ছিলেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাণীর ধারক ও বাহক। যুগে যুগে মহান আল্লাহ পথভ্রষ্ট মানবজাতির জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন—মতান্তরে এক লাখ চল্লিশ হাজারেরও বেশি—যেন তাঁর বান্দারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারে এবং শয়তানের পাতা ফাঁদ শিরক ও কুফর থেকে নিজেদেরকে রক্ষা পেতে পারে।

মহান আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলদের ধারাবাহিকতায় মুহাম্মাদ ﷺ মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল, যাঁকে "খাতামুন নাবিয়িন" বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর আগমনের পরে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কোনো নবী ও রাসূল আসবেন না। মানবজাতির জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নবুয়তি মিশন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদের বাণী শেষবারের মতো ওহীর মাধ্যমে দুনিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। নবুয়তের দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং মানবজীবন ও সমাজের সকল স্তর থেকে শিরক ও কুফরকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর কাবাঘর, যা পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র, প্রথম মানব আদম (আ.) নির্মাণ করেছিলেন শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে আল্লাহকে ভুলে শয়তানের প্ররোচনায় শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ আবারো নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষের হিদায়াতের জন্য। এই নবুয়ত ও হিদায়াত সূর্যের উজ্জ্বল

আলোকরশ্মির মতো, যা জাহেলিয়াত, কুফর ও শিরকের ঘন অন্ধকারকে দূর করে এবং মানুষের অন্তর ও জীবনকে তাওহীদের চেতনা ও বিশ্বাস দিয়ে আলোকিত করে।

মানবজাতির হিদায়াতের ইতিহাসে অসংখ্য নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে, যারা মানবসভ্যতাকে আলোকিত করেছেন এবং ঈমানের ভিত্তিতে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মিশনের এই মশাল নবীদের হাত ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়েছে। তাওহীদের সেই মশালের আলো কখনো ম্রিয়মাণ হয়েছে, কখনো ধিকিধিকি করে নিভুনিভু হয়ে জ্বলেছে আবার পরবর্তী সময়ে নতুন নবীর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের আলো পুনরায় পৃথিবীতে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে মক্কাসহ সারা পৃথিবী শিরকের অন্ধকারে গভীরভাবে নিমজ্জিত ছিল। মক্কার প্রতিটি ঘরে তখন শিরকের চর্চা হতো, এমনকি আল্লাহর পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহতেও তখন ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অন্তর, রীতিনীতি এবং সমাজের রসম-রেওয়াজ শিরকের প্রভাবে তখন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। তাওহীদের আলো যখন পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে নিভে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তখন জাহেলিয়াতের সেই ঘোর অন্ধকারে—নবী ইব্রাহীমের অল্পসংখ্যক হানিফা অনুসারী ছাড়া সমগ্র মানবজাতি শিরকের অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। জাহেলিয়াতের সেই ঘোরতর অন্ধকারে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবারে মাতা আমিনার গর্ভে এবং সদ্যপ্রয়াত পিতা আবদুল্লাহর ঔরসে জন্ম নেন মানবজাতির শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ । এবং তাঁর জন্মের ৪০ বছর পর পবিত্র রমাদানের লাইলাতুল কদরে হেরা গুহার নির্জনবাসে তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়ত লাভ করেন।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'নেই কোনো ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া'—এই মিশন শেষবারের মতো নতুন উদ্যমে প্রচারিত হয়। মানুষ আবারো খুঁজে পায় তার মহান রবকে; শয়তানের পাতা ফাঁদ শিরকের জালকে ছিন্ন করে। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের মতো, নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এরও দাওয়াতের মূল বাণী ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি মানবজাতিকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাদের রব শুধুমাত্র একজন, তিনি মহান আল্লাহ। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাদের বিধানদাতা এবং তিনিই আমাদের রিজিকদাতা। তাঁর কাছ

থেকেই আমরা আগত হয়েছি এবং দুনিয়ার জীবন শেষে আমরা আবারো তাঁর কাছেই ফিরে যাব। দুনিয়ার এই স্বল্পকালীন জীবনের পরে রয়েছে একটি অনন্ত জীবন। এই জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসাব পরকালে মহান আল্লাহর কাছে দিতে হবে। এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই সেদিন মানুষকে ক্ষমা করার, বান্দার গুনাহ মাফ করার এবং তাকে পুরস্কৃত করার ও শাস্তি দেবার। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই তাওহীদ, রিসালাত ও একত্বের বাণী পৌঁছে দেওয়াই ছিল প্রত্যেক নবীর নবুয়তের মিশন।

এই নবুয়তের মিশনে তাঁদের প্রধানতম বাধা ছিল মূর্তিপূজার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা—শিরকের সকল প্রকার ধারণা, মানুষের তৈরি জাহিল ধ্যান-ধারণা, শোষণ-জুলুম ও অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের সকল প্রকার রীতিনীতি ও আইনকানুন। নবুয়তের মিশনের দায়িত্ব ছিল একদিকে মানুষের মন-মগজে আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা, আর অন্যদিকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিগত, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করা। এককথায়, মানুষের জীবনের যত দিক আছে, তার সবদিককেই মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা—এটাই ঈমানের দাবি, আর তার বিপরীতটাই হলো শিরকের সূচনা।

মানুষ যেকোনো সময়, যেকোনো প্রয়োজনে তার মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মুখাপেক্ষী হবে। আর সেই একক রবের মুখাপেক্ষী হয়ে একজন বান্দার জীবন কেমন হবে, তার বাস্তব উদাহরণই হলো আমাদের নবীর পবিত্র জীবন। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের সামান্য জুতার ফিতার প্রয়োজন হলেও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।'

তাঁর সীরাত ও জীবনী হলো সেই শিরক-খণ্ডন মিশনের এক পূর্ণতা ও তার এক অনন্য উদাহরণ, যেখানে বান্দার জীবনের সকল প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হলেন একমাত্র আল্লাহ, আর কেউ নয়। একটি মুসলিম জীবনের শুরু হয় কানে আজান শোনার মাধ্যমে, আর মৃত্যুর সময় কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণের মাধ্যমে সেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। আর জীবনের মধ্যবর্তী সময় পরিচালিত হয় আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে, তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমে এবং নবীর সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে। একজন মুসলিমের এই জীবন সকল বয়সের, সকল সময়ের, সকল পেশার এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

'বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—সামনে থেকেও না, পেছন থেকেও না। এটি প্রজ্ঞাময়, চির প্রশংসিতের কাছ থেকে নাজিলকৃত।'(সূরা হামীম আস-সিজদাহ, আয়াত ৪২)

এককথায়, ঈমানের জীবনে শিরকের কোনো ঠাঁই নেই, শিরকের সাথে ঈমানের কোনো সহাবস্থান নেই এবং আল্লাহর বিধান পালনে শিরক প্রবেশের সামান্য কোনো সুযোগ নেই। একজন মুসলিমের চিন্তা, কথা, আদর্শ, বিশ্বাস বা কর্মে কিংবা কারো পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের যেকোনো পর্যায়েই হোক না কেন—কিংবা শৈশব, কৈশোর, যৌবন কিংবা বার্ধক্যে—জীবনের সব সময়, সকল ক্ষেত্রে ঈমানের জীবন হলো শিরকের অনুপ্রবেশবিহীন এক জীবন।

আল্লাহতে বিশ্বাসী একজন বান্দার জীবন কেমন হবে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো নবীর অনুপম চরিত্র, তাঁর নবুয়তের আদর্শ ও নবুয়তি জীবন। মূলত রাসূলের জীবন ও মিশন ছিল পৃথিবীতে তাওহীদের ভিত্তিতে একটি সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে বান্দার জীবনে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো শরিক থাকবে না। দিনের আলোতে যেমন রাতের অন্ধকার প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই, তেমনি নবুয়তের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি শিরকের ধারণাকে পরিপূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

তাই একজন মুসলিমের জীবন কেমন হবে, একটি মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র কেমন হবে সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সেই মহান নবীর জীবনী জানা, তাঁর পবিত্র জীবনের ঘটনাগুলো বিশদভাবে উপলব্ধি করা এবং বিশ্লেষণ করা মুসলিম হিসেবে আমাদের মৌলিক দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের নবীর জীবন বিস্তারিতভাবে জানার তাওফিক দান করুন, আল্লাহর হুকুম দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের তাওফিক দান করুন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে শিরকের প্রভাব দূর করুন, আমীন।

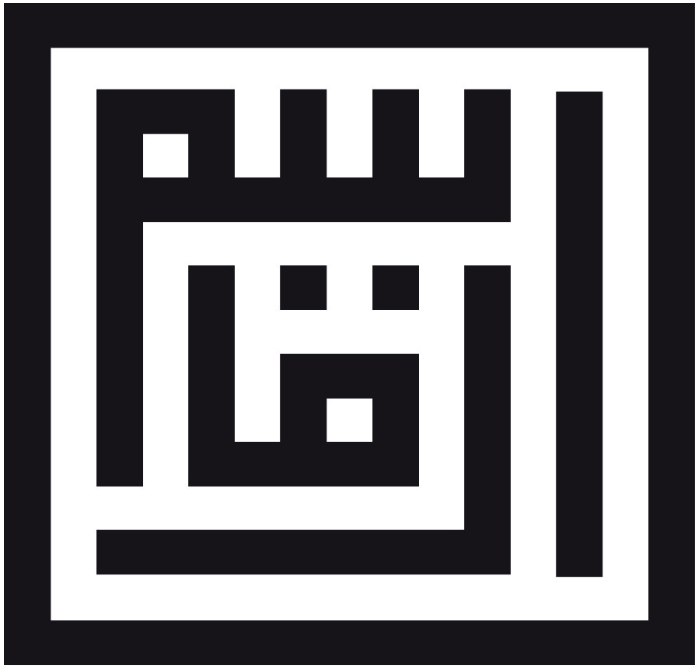

আল্লাহ প্রিয় নবীকে উম্মী রেখেছেন, যেটা তাঁর জন্য রহমত।
শিরকের জ্ঞান সে তো জ্ঞান নয়, সেটা জ্ঞানের নামে জহরত।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

‘হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারে রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইব্রাহীম এবং ইব্রাহীমের পরিবারে রহমত বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবারে বরকত দিন, যেমন আপনি ইব্রাহীম এবং ইব্রাহীমের পরিবারে বরকত দিয়েছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।’

ধারাক্রম

অধ্যায়-১: আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব **২৫**

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ২৫
আল-আমীন ২৯
উসওয়াতুন হাসানা ৩৩
রাসূলের তিনটি অবস্থান ৪২
মৌলিক অধিকার ৪৬
প্রাথমিক শিক্ষা ৪৯
পরিপূর্ণ হক আদায় ৫৩

অধ্যায়-২: জীবনের যোগসূত্রতা **৫৯**

জীবনের যোগসূত্রতা ৫৯
আবু লাহাবের শত্রুতা ৬৪
সত্যবাদী রাসূল ও মিথ্যাবাদী কাফির ৬৯
সবরের উত্তম শিক্ষা ৭৪
নবী ইব্রাহীমের বার্তা ৭৬
সন্তানের নামকরণ ৮০
নবীদের ঐতিহ্য ৮৪
দুই মহান নবীর মাকাম ৮৬
মসজিদুল আকসা ৯৪

অধ্যায়-৩: সত্য নবী **১০১**

কদরের রাত—নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ ১০১
তোমরা হুঁশিয়ার সাবধান ১০৬
সত্য স্বপ্ন ও আবু জাহলের উপহাস ১০৯
ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা ১১৫
কাবার মালিক কে? ১১৭
নারীরা পুরুষের অধীন আর পুরুষরা প্রথার অধীন ১২২
কুরআনের মুজিজা ১২৮
বদরের যুদ্ধ ১৩৩
রাসূলের নির্দেশ অমান্য করা ১৩৬
সর্বোত্তম আদর্শ ১৪২
ঘূর্ণিঝড় ১৪৭
মুনাফিক চরিত্র ১৫০
বিশ্বনবী ১৫৪
নবীর উপস্থিতি—উম্মতের রক্ষাকবচ ১৫৭
উম্মতের মর্যাদা ১৬২

অধ্যায়-৪: শ্রেষ্ঠত্বের মোড়কে আবৃত একটি দ্বীন **১৬৯**

শ্রেষ্ঠত্বের মোড়কে আবৃত একটি দ্বীন ১৬৯
মায়ের সম্মান ১৭২
মৌখিক স্বীকৃতি ১৭৫

লাইলাতুল কদর ১৭৯
রিজিক ১৮৩
পড়ো তোমার প্রভুর নামে—কিতাবময় এক জীবন ১৮৬
আমলের ভিন্নতা ১৮৯
রোজার পুরস্কার ১৯১
আমার উম্মতের সংখ্যা ১৯৪
সূরা মুলক ১৯৭
কৃতজ্ঞতার শক্তি ২০০
খাবারের দোষ-ত্রুটি ২০৬

অধ্যায়-৫: মহাসৌভাগ্যবান ব্যক্তি ২১১

উন্নত নেতৃত্বের গুণ ও সাহাবিদের সম্মান ২১১
মহাসৌভাগ্যবান ব্যক্তি ২১৬
নবীর প্রতি ভালোবাসা ২২৩
চারজন সাহাবির শাসনামল ২২৯
উমরের অসিয়ত ২৩৬

অধ্যায়-৬: ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ২৫৩

ইসলাম: পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ২৫৩
জান্নাতের পাথেয় ২৫৭
আল্লাহর তাসবীহ—একটি ত্রিমাত্রিক সমাধান ২৬৪
ওহী-ভিত্তিক সভ্যতা ২৭০
কুরআন ও রাসূলের জীবন: একটি জীবন্ত সংবিধান ২৭৫

নবীর জীবন আল্লাহর আদেশের সমানুপাতিক ও গোপনীয়তা প্রসঙ্গ ২৮৫
ইসলামে দাওয়াহর কাজ ২৯৪
কুরআন পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ২৯৮
মজলুমের দুআ ও নবীর সুন্নত ৩০৩
আকাবার চুক্তি ও হিজরত ৩০৮
আকাবার শপথ: ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৩১৫
হুদাইবিয়ার সন্ধি ৩২৬
১২ রবিউল আউয়ালের প্রকৃত তাৎপর্য ৩৩৩
প্রকৃতির ঋতুচক্র ও নবীর দাওয়াতি জীবন ৩৪০
পানির হাইড্রোজেন বন্ড ও নবীর শিক্ষা ৩৪৬
'কুতিবা আলাইকুম' ও ইসলামি রাষ্ট্রের মডেল ৩৫৬
কুরআন ধারণের পাত্র ৩৬৫
নবুয়ত, রিসালাত ও খিলাফত ৩৭৪
খিলাফত শাসন—নিরাপদ জীবনের ঠিকানা ৩৮২

অধ্যায়-৭:জীবনের শেষ দৃষ্টি ৩৯১

নবীজির সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৯১
শোক প্রকাশ ৪১২
মুহাম্মাদ—আল্লাহর নবী ৪১৪
নবীয়ে কামালিয়াত ৪২৮
জীবনের শেষ দৃষ্টি ৪৫১

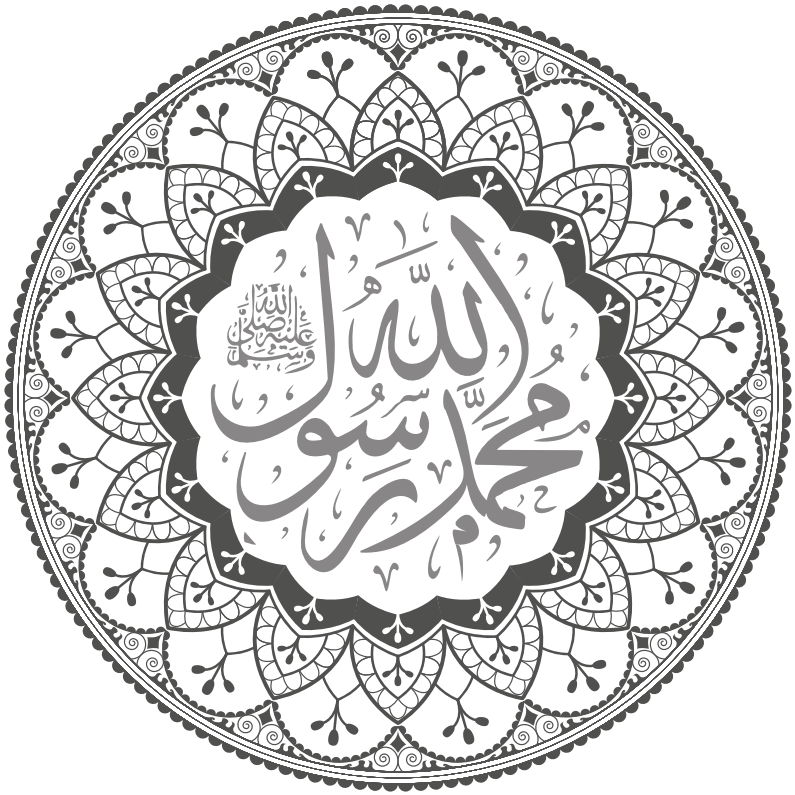

মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ

অধ্যায়ঃ ০১
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

> *সারাজীবন গুরুভার দায়িত্ব নিয়ে এবং কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে এর হাজার ভাগের একভাগও যদি আমাদের জীবনে হতো, তাহলে আমরা অভাব-অভিযোগ ও দোষারোপ করা ছাড়া কখনোই আল্লাহর প্রশংসা করতাম না।*

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য প্রেরিত শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর পবিত্র জীবনী পড়লে যে কেউ বিস্ময়ে হতবাক এবং গভীরভাবে অভিভূত হবেন। কারণ, তাঁর জীবনের এমন কোনো পর্যায়, অধ্যায়, ক্ষেত্র বা বিষয় নেই, যেখানে মহান আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষা করেননি। সংক্ষেপে দেখা যাক, মাত্র ৬৩ বছরের জীবনে তিনি কী ধরনের বিশাল পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন:

জন্মের আগেই তিনি পিতৃহীন হন। ফলে পিতার আদর ও স্নেহ কী জিনিস, তা তিনি কোনোদিনই অনুভব করতে পারেননি। শৈশব না পেরোতেই মাত্র সাত-আট বছর বয়সে জন্মদাত্রী মা আমিনা এবং দাদা আবদুল মুত্তালিবকে হারিয়ে তিনি পুরোপুরি এতিম হয়ে পড়েন। এরপর চাচা আবু তালিবের ঘরে তিনি লালিত-পালিত হন, তবে সেখানেও ছিল না কোনো সম্পদ বা বিত্তের প্রাচুর্য; বরং তিনি অত্যন্ত সাধারণ ও দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপন করতেন এবং শৈশবে তাঁর শিক্ষারও কোনো সুযোগ মেলেনি। পরবর্তী সময়ে ২৫ বছর বয়সে বিয়ে হবার পর তিনি স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর মাধ্যমে ধন-সম্পদের অধিকারী হন, কিন্তু সেই সম্পদও তিনি গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেন।

হেরা গুহায় ৪০ বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্তির পর শুরু হয় জীবন-পরীক্ষার আরেক নতুন অধ্যায়। মক্কার পরিচিত মানুষ এবং পরিচিত পরিবেশ চরম বিরূপ হয়ে যায়। যে সমাজে তিনি ছিলেন আল-আমীন (বিশ্বস্ত) এবং পরম সম্মানিত, সেই সমাজেই আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর কারণে নিজ গোত্রের কাছে তাঁকে চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

পবিত্র কাবাঘরে নামাজরত অবস্থায় তাঁর মাথায় উটের নাড়িভুঁড়ি ফেলে দেওয়া হয়, তাঁর বাসায় ময়লা-আবর্জনা ছুড়ে ফেলা হয়, বাসা থেকে বের হওয়ার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়। দ্বীনের দাওয়াত ও তাওহীদের কথা বলার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নানারকম চিৎকার, হইচই ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর কথা শোনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়।

এর মধ্যে খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে চারটি কন্যা এবং দুটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়, কিন্তু তাঁর দুই পুত্রই শৈশবে মারা যায়। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী ও আপন চাচা আবু লাহাব তাঁকে 'বংশহীন' বলে উপহাস করে এবং মানসিক নির্যাতন চালায়। মক্কায় দাওয়াতের সংকীর্ণ ও ভীতিকর পরিবেশে তাঁকে প্রতিনিয়ত মিথ্যাবাদী, পাগল, জাদুকর, গণক, পরিবারের সাথে সম্পর্ক বিনষ্টকারী এবং পূর্বপুরুষের ধর্ম ও দেবতাদের অবমাননাকারীসহ নানান অপবাদ দেওয়া হয়। এমনকি তাঁকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়।

এরপর নবী ﷺ-কে তাঁর নিজ গোত্র বনু হাশেমসহ তিন বছরের জন্য সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়, যার ফলে তাঁদেরকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে একঘরে করে ফেলা হয়। এই বয়কটের কারণে সীমাহীন খাদ্য সংকট ও জীবন বিপন্নতার মধ্যে নারী-পুরুষ-শিশুসহ সকলকে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। বয়কট সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই নবুয়তের নবম ও দশম বর্ষে তাঁর সামাজিক ও মানসিক নিরাপত্তার প্রধান আশ্রয়—স্ত্রী খাদিজা (রা.) এবং চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন।

এরপর তিনি নবুয়ত প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ নগরীতে যান, যেখানে তাঁকে সবচেয়ে নির্মম ও কঠোর শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। তায়েফের মানুষ তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে এবং নবুয়তের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর তিনি মক্কায় ফিরে এলে কুরাইশরা পরামর্শ করে সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। আল্লাহর নির্দেশে তিনি রাতের আঁধারে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করে মক্কা শহর ত্যাগ করেন এবং পথিমধ্যে তিন দিন একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

মদীনায় পৌঁছে শুরু হয় তাঁর জীবনের এক নতুন উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায়, যা মক্কার জীবন থেকেও বহুমাত্রিক সমস্যায় ভরপুর ছিল। বদর, উহুদ, খন্দক ও তাবুকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি তাঁর প্রিয় চাচা হামজা (রা.), চাচাতো ভাই আবু জাফর (রা.)-সহ অসংখ্য প্রিয় সাহাবিকে হারান। উহুদ যুদ্ধে তিনি নিজেও শারীরিকভাবে মারাত্মক আহত হন।

মদীনাতে ইহুদি ও মুনাফিকদের অবিরত ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যেই তাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে তাঁর চার কন্যার তিনজনই ইন্তেকাল করেন। এ ছাড়া মদীনায় আরো এক পুত্রসন্তান শৈশবেই মারা যায়। এক ইহুদি নারী খাবারে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে, আরেকজন জাদু করে তাঁকে অসুস্থ করে ফেলার চেষ্টা চালায়।

এসব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন, যেখানে তিনি অবিরাম কঠোর থেকে কঠোরতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় তাঁকে পেটে পাথর পর্যন্ত বাঁধতে হয়েছে। দিনের পর দিন সামান্য খেজুর ও পানি পান করে কাটাতে হয়েছে। যে বিছানায় তিনি ঘুমাতেন, তা ছিল শক্ত চাটাই। এমনকি সাহাবি উমর (রা.)-এর মতন শক্ত পুরুষ তাঁর পিঠে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি সমগ্র আরবের একচ্ছত্র শাসনকর্তা হলেও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না।

এভাবেই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তিনি গোটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। অথচ কখনো আল্লাহর প্রতি কোনো অভিযোগ করেননি। বরং সব সময় আল্লাহর পবিত্রতা,

প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করেছেন। তিনি রাতভর তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন এবং দিনের বেলায় প্রায়ই রোজা রাখতেন। উম্মতের প্রতিও তিনি কোনোদিন বিরক্তি প্রকাশ করেননি বা অভিযোগ করেননি যে, তোমাদের জন্যই আমি এত এত কষ্ট করলাম। বরং উম্মতের কল্যাণের চিন্তায় তিনি সব সময় উদ্বিগ্ন ছিলেন—কীভাবে উম্মতের কল্যাণ হবে, কীভাবে উম্মত কিয়ামতের দিন মুক্তি পাবে, এই চিন্তায় তিনি সব সময় বিভোর ছিলেন। এমনকি মৃত্যুর সময়েও তিনি 'উম্মতি, উম্মতি' বলে উম্মতের কথা স্মরণ করে গেছেন।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ কখনোই নিজ বংশ বা কুরাইশ গোত্রকে দায়ী করে বা দোষারোপ করে জীবনে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি; বরং মক্কা বিজয়ের পর যারা তাঁকে মক্কায় চরম অপমান ও নির্যাতন করেছিল, হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তাদের সকলকেই তিনি নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কেবল কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া।

নবুয়তের গুরুদায়িত্ব ছিল অত্যন্ত ভারী। দীর্ঘ টানা ২৩ বছর ধরে অল্প অল্প করে কুরআন নাজিল হওয়া, তা আয়ত্ত করা, উম্মতের কাছে আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া ও তা ব্যাখ্যা করার গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। এ ছাড়া সব সময় উম্মতের প্রয়োজনের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আদেশ, নিষেধ, উপদেশ এবং পরামর্শ দেওয়া—এসবই ছিল তাঁর মক্কা ও মদীনার জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

এত সব গুরুদায়িত্ব এবং ধারাবাহিকভাবে কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও তিনি কখনোই আল্লাহর প্রতি সামান্য কোনো অভিযোগও জানাননি। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এর হাজার ভাগের এক ভাগও যদি আমার-আপনার জীবনে ঘটত, তাহলে আমরা কেবল অভাব-অভিযোগ করা ছাড়া কখনোই আল্লাহর প্রশংসা করতাম না; বরং আল্লাহসহ অন্যদের দোষারোপ করেই আমাদের জীবন কাটাতাম।

হ্যাঁ, এমনই একজন ব্যতিক্রমী, অসাধারণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তিনিই আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী, আমাদের প্রিয় রাসূল এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক—উসওয়াতুন হাসানাহ বা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠান। পুরো মানবজাতির ইতিহাস ঘেঁটেও এমন আরেকজন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা তাঁরই সৌভাগ্যবান উম্মত। দরুদ ও সালাম তোমারই জন্য, হে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল-আমীন

> *অন্যায়, জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যা কথা ও আমানতের খিয়ানত করা ছিল যে সমাজের মুখ্য বৈশিষ্ট্য, সেই সমাজের একজন ব্যতিক্রম ব্যক্তি আল-আমীন!*

নবী মুহাম্মাদ ﷺ নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর সমাজে 'আল-আমীন'—অর্থাৎ, সর্বোচ্চ বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তৎকালীন সমাজ ছিল এক দুর্গন্ধময় পঙ্কিল আবর্ত, যেখানে আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা ও নিয়মকানুনের কোনো প্রকার প্রচলন ছিল না। বরং গোত্রের ক্ষমতা ও অর্থবিত্তের প্রভাবই ছিল সেই সমাজে টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন। দুর্বলের ওপর সবলের অন্যায় আচরণ, জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যা কথা ও সমাজের সর্বস্তরে আমানতের খিয়ানত করা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ একটি ব্যাপার। সমাজের সেই কলুষিত পরিবেশে কোনো ব্যক্তির জন্য সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে এমন একটি খেতাব পাওয়া এবং সর্বস্তরের মানুষের আস্থা অর্জন করা সহজ কোনো বিষয় ছিল না।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর চরিত্রের মধ্যে আল-আমীন বা বিশ্বস্ততার গুণাবলি সীরাতগ্রন্থগুলোতে প্রাক-নবুয়ত যুগের ক্ষেত্রেই বেশি আলোচিত হয়। তবে বাস্তবতা হলো, নবুয়তপ্রাপ্তির পরেই তাঁর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যা সীরাতগ্রন্থগুলোতে হয়তো ততটা আলোচিত হয় না।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নবুয়ত বা ওহী নাজিলের প্রথম ঘটনা ঘটে যখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। তিনি তখন সমাজ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে মক্কার অদূরে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এটি নির্দেশ করে যে, নবুয়তের আগে থেকেই তাঁর মধ্যে সমাজের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধ ছিল। জাহেলি সমাজের করুণ রূপ দেখে, সমাজে বিদ্যমান অন্যায়-নিপীড়ন দেখে, দুর্বলের প্রতি সবলের নির্যাতন দেখে, সমাজের বৈষম্য ও অবিচার দেখে তিনি গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন, দুঃখিত ছিলেন; কিন্তু তিনি জানতেন না কীভাবে এ মারাত্মক সমস্যার সমাধান হবে।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল ও অসহায় মানুষদের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করতেন, যার প্রমাণ তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.) একটি হাদীসে উল্লেখ করেছেন। তবে সমাজের বিদ্যমান ব্যাপক সমস্যার তুলনায় সেই সাহায্য বাস্তব কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারছিল না। এ কারণে তিনি সমাজ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেরা গুহায় গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে কোনো এক সত্তার কাছে শান্তির পথের সন্ধান করছিলেন।

এই অবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। হেরা গুহায় ওহী নাজিলের মাধ্যমে আল্লাহ সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল করেন, যা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় এবং সৃষ্টির উৎপত্তি সম্পর্কে জানান দেয়। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ওহীর জ্ঞানের সূচনা, তবে এখানে খাস করে নবীর জন্য করণীয় কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না।

অতঃপর কিছুদিন বিরতির পর জিব্রাইল (আ.) যখন দ্বিতীয়বার আসেন, তখন শুরু হয় নবুয়তের গুরুদায়িত্ব। সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাজিল হয়, যার প্রথম দুটি আয়াত ছিল: 'হে বস্ত্রাবৃত, উঠো এবং সাবধান করো।' এই আয়াতদ্বয় সরাসরি নবী ﷺ-কে দাওয়াতের কাজ শুরু করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।।

এরপর ধারাবাহিকভাবে ওহী নাজিল হতে থাকে, যা দীর্ঘ ২৩ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। কুরআন মানবজাতির প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি বিশাল আমানত। কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি এটি পাহাড়ের ওপর নাজিল করা হতো, তবে সেই পাহাড় মহান আল্লাহর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিলেন, 'হে বস্ত্রাবৃত, উঠো এবং সাবধান করো।' অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া এই আমানত মানুষকে পৌঁছে দাও এবং তাদেরকে আখিরাতের প্রতিফল দিবস সম্পর্কে সতর্ক করো।

এখানে 'বস্ত্রাবৃত' শব্দটি ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ যেমন শীতের সময় আরাম ও নিরাপত্তার জন্য গায়ে কম্বল বা লেপ জড়িয়ে নেয়, তেমনি নবীকে বলা হয়েছে তোমার জীবনের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে উঠো এবং পরকালের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে মানবজাতিকে সাবধান করো।

ওয়াল্লাহি, এরপর থেকে যদি আমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ পরবর্তী ২৩ বছরের জীবন পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, আল্লাহর এই নির্দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কীভাবে নিজ জীবনের সমস্ত আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে এক দারিদ্র্যময়, সহজ-সরল জীবন বেছে নিয়েছেন; নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে। তিনি নিরলসভাবে দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেছেন—সকল প্রকার ভয়-ভীতি, নির্যাতন, বয়কট, হত্যা প্রচেষ্টা, যুদ্ধ—কোনো কিছুই তাঁর দাওয়াতি মিশনকে থামাতে পারেনি।

নবুয়ত লাভের পরে তিনি কখনোই তাঁর ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের কথা একদিনের জন্যও চিন্তা করেননি, বরং আল্লাহ যখন যেভাবে তাঁকে আদেশ করেছেন তিনি শঙ্কাহীনভাবে আল্লাহর আদেশ সেভাবেই পালন করেছেন। সীরাতে আপনি এমন একটি উদাহরণও খুঁজে পাবেন না, যেখানে তিনি নিজের আরামকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহর হুকুমকে পাশ কাটিয়েছেন। জীবনব্যাপী এমন আমানতদারি রক্ষা তথা আল্লাহর আয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মাঝে আপনি খুঁজে পাবেন না।

এরপর আমরা যদি নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনে করা সামাজিক চুক্তিগুলোর দিকে তাকাই, যেমন মদীনায় ইহুদিদের সাথে করা মদীনা সনদ ও কুরাইশদের সাথে কৃত হুদাইবিয়ার সন্ধি, তাহলে আমরা দেখতে পাই তিনি কীভাবে চুক্তিগুলোর মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি মুসলিমদের জন্য আপাতদৃষ্টিতে অসম ও বৈষম্যমূলক মনে হলেও নবী ﷺ নিজ থেকে কখনোই কোনো চুক্তি ভঙ্গ করেননি। বরং পরবর্তী সময়ে এসব চুক্তি ভঙ্গের দায় ইহুদি সম্প্রদায় ও মক্কার কুরাইশদের উপরই পড়েছিল। তিনি সর্বদাই সকল চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং প্রতিপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ না করা পর্যন্ত তিনি তার সকল শর্ত মেনে চলেছেন।

মক্কা থেকে যখন তিনি মদীনায় হিজরত করেন, তখন তাঁর নিজের জীবন ছিল বিপন্ন। তথাপি তিনি তাঁর কাছে গচ্ছিত সমস্ত আমানত আলী (রা.)-কে বুঝিয়ে দেন, যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে আলী (রা.) সেগুলো আমানতকারীদের কাছে সঠিকভাবে ফিরিয়ে দেন। এখানেও গচ্ছিত সম্পদের আমানত রক্ষারও এক উন্নত দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর এবং হুনাইনের যুদ্ধ বিজয়ের পরে সমগ্র মক্কা শহরের ওপর যখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মদীনার আনসার সাহাবিরা এই আশঙ্কা করেছিলেন যে, নবী ﷺ হয়তো এখন মক্কা শহরে থেকে যাবেন, কারণ এটিই তাঁর জন্মভূমি এবং সেখানেই তাঁর বংশের ও গোত্রের লোকেরা বসবাস করে। কিন্তু তাদের সে অমূলক আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে তিনি ﷺ তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কা শহর ছেড়ে মদীনায় চলে আসেন।

কারণ দীর্ঘ ১০ বছর আগে আকাবায় যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে তিনি ﷺ বলেছিলেন, 'তোমাদের রক্ত আমার রক্ত, তোমাদের ধ্বংস আমার ধ্বংস। আমি তোমাদেরই এবং তোমরা আমার।' সেই চুক্তির প্রতি আস্থাশীল থেকে রাসূল ﷺ মদীনায় থেকে যান এবং পরবর্তীকালে তিনি ﷺ মদীনাতেই ইন্তেকাল করেন। আজও তিনি সেখানেই শায়িত আছেন—আকাবার সেই চুক্তি ও ওয়াদার আমানতের প্রতিফলন হিসেবে।

আবার বিদায় হজের সময় যখন তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এটি হয়তো তাঁর জীবনের শেষ বছর হতে পারে, তখন জাবালে আরাফাতে দাঁড়িয়ে তিনি ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তোমরা কী উত্তর দেবে?' সাহাবিরা বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার ওপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব/আমানত আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন।' রাসূল ﷺ আকাশের দিকে শাহাদাত আঙুল তুলে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।'

প্রিয় রাসূলের ﷺ সমগ্র জীবন—হোক তা নবুয়তের আগে বা পরে—তিনি সর্বদাই 'আল-আমীন', এক পরম বিশ্বস্ত আমানতদার হিসেবে থেকেছেন।

উসওয়াতুন হাসানা

সকল নবীর জীবন পরীক্ষার সম্মিলনে কেমন হতে পারে একজন নবীর জীবন?

আল্লাহর রাসূল ﷺ রমাদানের শেষ ১০ দিন কীভাবে কাটাতেন, তা আমরা আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের মাধ্যমে জানতে পারি। হাদীসে উল্লেখ আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রতি বছর রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। রমাদানের এই শেষ ১০ দিন তিনি আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে কাটাতেন। তবে ব্যতিক্রম ছিল তাঁর জীবনের শেষ বছর, হিজরী দশম বর্ষের রমাদান মাসে, যখন তিনি একটানা ২০ দিন মসজিদে নববীতে ইতিকাফ করেছেন।

ইতিকাফ বলতে মসজিদের মধ্যে নিজেকে বন্দি করে পুরো সময়টিকে আল্লাহর জন্য অতিবাহিত করা এবং দুনিয়াবি সকল কাজ-কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা বোঝায়। আমরা 'সাওম' শব্দের অর্থ জানি, এর অর্থ হলো বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানীয়, খাবার এবং যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা হলো সাওম। এর পাশাপাশি যাবতীয় অন্যায় ও হারাম কাজ থেকে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখাও সিয়ামের মূল দাবি। সিয়াম সাধনার মূল উদ্দেশ্য হলো এই নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা, অর্থাৎ আল্লাহভীতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

রমাদানের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য হলো দিনের এবং রাতের প্রায় পুরো সময়টিই শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য সকল দুনিয়াবি কাজ থেকে বিরত থাকা। এর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি নিজেকে আরো এক ধাপ উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

রমাদানের প্রথম ২০ দিনের মতো নিজ ঘরের আরাম-আয়েশ, পরিবারের নৈকট্য এবং দুনিয়ার সাধারণ কার্যক্রম থেকে বিরত থেকে শেষ দশকের দিন-রাতকে একমাত্র আল্লাহর

ইবাদতের জন্য মসজিদে কাটানো হয়। সুবহানআল্লাহ! এটি হলো আল্লাহর ইবাদতের একটি সর্বোচ্চ পর্যায়, যেখানে বান্দা আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোনো দুনিয়াবি কাজ করে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের প্রায় প্রতিটি রমাদানেই এই ইতিকাফের আমল করেছেন।

এখন আমরা বিষয়টি আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করব। কেন তিনি 'উসওয়াতুন হাসানা' অর্থাৎ সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে ইতিকাফের এই রীতিকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, এবং কেন এটি তাঁর উসওয়াতুন হাসানার অংশ?

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনে আমরা পূর্ববর্তী প্রায় সকল নবী-রাসূল ও নেক বান্দাদের জীবন থেকে প্রাপ্ত সকল ধরনের পরীক্ষা এবং গুণাবলির এক অদ্ভুত সম্মিলন দেখতে পাই। পূর্ববর্তী যুগের নবী এবং নেককার বান্দারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে সকল কঠোর ইবাদত করেছেন এবং যে সকল পরীক্ষা দিয়েছেন, তার সমস্ত কিছুই যেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনে উপস্থিত ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, ঈসা (আ.)-এর মাতা মারইয়াম (আ.)-কে তাঁর পিতা-মাতা এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে উৎসর্গ করেছিলেন। মারইয়াম (আ.) দিন-রাতের সমস্ত সময় মসজিদে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশে কাটাতেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন রমাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন, তখন তাঁর জীবনে সেই কঠোর পর্যায়ের ইবাদতের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। যদিও তাঁর শরিয়তে ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদরের বরকত ও সাওয়াব অর্জন করা, কিন্তু এটি আল্লাহর প্রতি ইবাদতের এক একান্ত নিবেদন ও আত্মনিয়োগের এক অনন্য প্রতীক।

আল্লাহ নবী ইব্রাহীম (আ.)-কে আগুনে ফেলার মতো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন, যখন তাঁকে তাঁর স্বজাতির লোকেরা অস্বীকার করেছিল। একইভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তাঁর স্বজাতির লোকেরা পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত করেছিল। নবী ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজ দেশ ও বংশ ত্যাগ করে হিজরত করেছিলেন, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-ও আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে নিজ শহর মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। ইব্রাহীম (আ.) মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য তাঁর সন্তানকে

নিয়ে কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-ও তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর ইবাদতের জন্য মক্কা বিজয়ের পর কাবা থেকে এবং মক্কা থেকে সকল বাতিল উপাস্য, মূর্তি ও প্রতিমা অপসারণ করেছিলেন।

মুসা (আ.)-কে আল্লাহ তুরে সাইনায় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, যা ছিল তাঁর জন্য এক বিশেষ সম্মান। মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কেও মিরাজের রাতে সাত আসমানের ওপরে নিয়ে তাঁর সাথে একান্তে কথা বলেছিলেন। মুসা (আ.)-এর মুজিজা হিসেবে আল্লাহর হুকুমে সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, আর রাসূল ﷺ-এর মুজিজা হিসেবে আল্লাহর হুকুমে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। মুসা (আ.)-কে আল্লাহ একটি বড় উম্মত দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উম্মতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। একইভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-কেও আল্লাহ বড় উম্মত দিয়েছেন, এবং মদীনার মুনাফিক ও অবাধ্য ইহুদিরা তাঁকে দারুণভাবে বিচলিত ও কষ্ট প্রদান করেছিল।

এভাবে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনে পূর্ববর্তী প্রায় সকল নবীদের জীবনের প্রায় সকল ঘটনা ও পরীক্ষার এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল। রাসূল ﷺ-এর জীবন ছিল পূর্ববর্তী সকল নবীদের জীবনের বিশেষ গুণাবলির এক সমাবেশ এবং অপরদিকে তিনি হলেন শেষ নবী, যার জীবনের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত সকল উম্মতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাই তাঁর পবিত্র জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই যেমন রয়েছে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা, অপরদিকে রয়েছে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, আত্মনিবেদন এবং মানবতার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার এক উত্তম প্রতিচ্ছবি।

ইয়াকুব (আ.) তাঁর আদরের সন্তান ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে এত কেঁদেছিলেন যে, তিনি অন্ধ হয়ে যান, যদিও তাঁর মোট পুত্রসন্তান ছিল ১২ জন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনে তিনজন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তিনজনই শৈশবে ইন্তেকাল করেন।

নবী ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভাইয়েরা হত্যার ষড়যন্ত্র করে কূপে নিক্ষেপ করে এবং তাঁকে বাড়ি ও এলাকা থেকে বিতাড়িত করে। পরবর্তীকালে ইউসুফ (আ.) মিশরের শাসনকর্তা হয়ে যখন তাঁর ভাইদের সম্মুখীন হন, তখন তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের ক্ষমা করে দেন, যদিও ইউসুফ (আ.)-এর হাতে তখন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ছিল।

একইভাবে, রাসূল ﷺ-কেও তাঁর স্বজাতি কুরাইশ ভাইয়েরা হত্যার ষড়যন্ত্র করে, যে কারণে তিনি মক্কা শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে মক্কা বিজয়ের পর, তিনি কুরাইশদের পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন, যদিও তাঁর হাতেও তখন নগর এবং রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল।

নবী ইউনুস (আ.)-কে আল্লাহ মাছের পেটে রেখে পরীক্ষা করেন। দুনিয়াতে তখন তাঁকে সাহায্য করার মতো আর কেউ ছিল না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। একইভাবে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ গারে সাওর পাহাড়ের সংকীর্ণ গুহায় তিন দিন কাটিয়েছিলেন। শত্রুরা প্রায় হাতের নাগালে চলে এসেছিল এবং চরম অসহায় অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তখন আর কেউ তাঁকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না।

নবী আইয়ুব (আ.)-কে আল্লাহ কঠিন অসুস্থতার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। রাসূল ﷺ-কেও এক ইহুদি নারী খাবারে মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করে হত্যা চেষ্টা করেছিল এবং সেই বিষাক্ত খাবার খেয়ে একজন সাহাবির সাথে সাথে মৃত্যু হয়। রাসূল ﷺ-কেও সেই বিষক্রিয়ার যন্ত্রণা বহুদিন সহ্য করতে হয়েছিল।

নবী দাউদ (আ.) নিয়মিত একদিন পরপর রোজা রাখতেন। মুহাম্মাদ ﷺ-ও সপ্তাহে দুই দিন এবং রমাদান ও শাবান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে কমপক্ষে তিন দিন রোজা রাখতেন। শাবান মাসে তিনি প্রায় পুরো মাস রোজা রাখতেন। দাউদ (আ.)-এর যেমন অসংখ্য স্ত্রী ছিল, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-এরও পবিত্র জীবনেও একসাথে নয়জন স্ত্রী ছিল এবং সকলের সঙ্গে তিনি সুন্দর ভারসাম্য আচরণ করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড়ো পরীক্ষা, কারণ প্রত্যেক স্ত্রীর মনোভাব এবং আচরণ স্বাভাবিকভাবেই আলাদা ছিল। দাউদ (আ.)-এর মতোই আল্লাহর রাসূল ﷺ-ও জীবনে অসংখ্য যুদ্ধে সম্মুখ থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর চরম বিপদের সময়। তেমনি রাসূল ﷺ-কেও জীবিত অবস্থায় মিরাজের মাধ্যমে আল্লাহ সাত আসমান ভ্রমণ করিয়েছেন, যখন স্ত্রী খাদিজা (রা.) এবং চাচা আবু তালিবের ইন্তেকালের পর তিনি মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিলেন এবং মক্কায় দাওয়াহর পরিবেশও অত্যন্ত

সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এমন একটি নাজুক সময়ে ইসরা ও মিরাজের ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে ﷺ সম্মানিত করেন এবং তিনি মানসিকভাবে এই দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।

আল্লাহ নবী সুলাঈমান (আ.)-কে বাতাসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে দূরদেশে ভ্রমণ করিয়েছেন। তেমনি আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কেও বোরাকের মাধ্যমে মিরাজের রাতে স্বল্প সময়ে বায়তুল মাকদিস ভ্রমণ করিয়েছেন। মারইয়াম (আ.)-কে যেমন তার স্বজাতির লোকেরা চারিত্রিক অপবাদ দিয়ে কষ্ট দিয়েছিল ঈসা (আ.) জন্মের পরে, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনেও আয়েশা (রা.) এর ইফকের ঘটনার মাধ্যমে চারিত্রিক মিথ্যা অপবাদের মুখে চরম ধৈর্য ও সবরের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

সুবহানআল্লাহ! প্রায় সকল নবীর জীবনের সম্মিলিত পরীক্ষা, গুণাবলি এবং সম্মান-মর্যাদার এক অনন্য সংমিশ্রণ হলো আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পবিত্র জীবন। পূর্ববর্তী একেকজন নবীর জন্য মাত্র একটি বা দুটি ঘটনা ছিল তাদের জীবনের পরীক্ষা, পক্ষান্তরে প্রায় সকল নবীর সম্মিলিত পরীক্ষা, গুণাবলি এবং সম্মানের এক অনন্য মিশ্রণ হলো আখেরী নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পবিত্র জীবন। নানারকম পরীক্ষা, কষ্ট, শারীরিক নির্যাতন এবং মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও রাসূলের পবিত্র মুখে সব সময়ই ছিল মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতা। সমস্ত ফরজ ইবাদতের পরও তিনি রাতভর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বেশি বেশি তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন।

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব, আয়াত ২১)

কী অসাধারণ একজন মানুষ! আর কী অসাধারণ একটি জীবন! সুবহানআল্লাহ! তাইতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকেই মানবজাতির জন্য উসওয়াতুন হাসানা, অর্থাৎ সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

আর কী বিশাল সৌভাগ্য যে আল্লাহ আমাদের এমন মহান নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা যেন তাঁর পবিত্র জীবন, আমল, আখলাক এবং দাওয়াহর কাজকে আমাদের জীবনে অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে পবিত্র করতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে নবী ﷺ-এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

চন্দ্রে ফাটল

সত্য কীভাবে অস্বীকার করো, যখন চন্দ্রে হলো ফাটল?
সত্যের পরীক্ষা নিতে মক্কার কাফিররা, হয়ে গেল বিহ্বল।
সত্যদ্রোহী কাফিরদের হলো কিনা, প্রমাণ ও নিদর্শনের প্রয়োজন।

নবী হিসেবে তোমাকে মানবো আমরা, যদি চাঁদকে করো খণ্ডিত।
সেই নিদর্শন আজও রয়ে গেল, কিন্তু মূর্খরা রইল হিদায়াত বঞ্চিত।
এক টুকরো চাঁদ পূর্বে হেলে গেল, আর এক টুকরো পশ্চিমে।
নবী নিশ্চই করেছে জাদু, তারা বলে আমরা ছিলাম বিভ্রমে।

কাফিরদের এটা চিরায়ত স্বভাব, সত্যকে অস্বীকার করার।
আকাশের ফেরেশতা জমিনে নামলেও, ভান করে না দেখার।
চন্দ্র বিদীর্ণ এক বিশাল ঘটনা, যা কিয়ামতের নিদর্শন।
সত্যের আহ্বানে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়, কিন্তু কাফিরের অন্তর হয় না উন্মোচন।

তেরটি বছর ধরে রাসূলের আহ্বান, সাক্ষী রইল মক্কার অলিগলি।
আরও সাক্ষী রইল আকাশের চাঁদ, সেই কাহিনি তোমাদের বলি।
আল্লাহর কালাম–আল্লাহর রাসূল, তোমরা আর কত চাও নিদর্শন?
সত্যকে একদিন নিজ চোখে দেখবে, বড্ড দেরি হবে সে দর্শন।

সত্যদ্রোহের পরিণাম ভয়াবহ, চারপাশে হাজারো নিদর্শন উপস্থিত।
এত নিদর্শন এত অনুগ্রহ, আফসোস তবু কাফিরদের ফেরেনি সংবিৎ।

ভালোবাসো তোমরা

ভালোবাসো তোমরা নবী ঈসাকে, ভালোবাসো নবী মুহাম্মাদ।
নবীরা সবাই আল্লাহর বান্দা, আমরা তাঁদেরই উম্মত

ভালোবাসো তোমরা নবী মুসাকে, ভালোবাসো নবী আহমাদ।
নবীরা হলেন মানবজাতির জন্য, আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ সম্পদ

ভালোবাসো তোমরা নবী ইব্রাহীমকে, ভালোবাসো নবীয়ে মোস্তফা।
নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠাতে, মুমিনরা কখনো দেয়নি ইস্তফা

ভালোবাসো তোমরা নবী দাউদকে, ভালোবাসো শেষ পয়গাম্বর।
তাওহীদের বাণী একটাই ছিল, যেমন আকাশ যুগে যুগে নীলাম্বর

ভালোবাসো তোমরা নবী সুলাঈমানকে, ভালোবাসো আবুল কাসিম।
সুলাঈমানের বংশ যেমন সম্মানিত, তেমনি সম্মানিত বনু হাশিম

ভালোবাসো তোমরা নবী আদমকে, ভালোবাসো রাহমাতুল লিল আলামীন।
মানুষের জন্ম-মৃত্যু চিরকালই ছিল, মহান আল্লাহর ক্ষমতার অধীন

ভালোবাসো তোমরা নবী নুহকে, ভালোবাসো যার হাতে কাউসার।
জাহান্নামের শাস্তি তাদের জন্য, যারা দুনিয়ায় করেছে অনাচার

ভালোবাসো তোমরা নবী ইউসুফকে, ভালোবাসো যিনি করবেন শাফাআত
জীবন সংশয়েও নবীরা সমুন্নত রেখেছেন, মহান আল্লাহর আয়াত

হিদায়াতের জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন, বিশ্বস্ত নবী ও রাসূল।
আল্লাহর কিতাবে ভুল নেই কোনো, কুরআনের বাণী শতভাগ নির্ভুল

নবীরা দায়িত্ব পালন করেছে, পৌঁছে দিয়েছে আল্লাহর বাণী।
নবীদের কারণে রোজ হাশর-নাশর, কিয়ামত কাকে বলে জানি

নবীর ধারাবাহিকতায় মুহাম্মাদ মুস্তাফা, সর্বশেষ আখেরী নবী
আল-কুরআন দিয়েছে মুমিনের অন্তরে, জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি

নবীদের নিয়ে ভেদাভেদ করোনা, করোনা বাড়াবাড়ি
যারা বলে নবীরা আল্লাহর পুত্র, তাদের সাথে ঈমানের ছাড়াছাড়ি

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করোনা, কাল কিয়ামতে হবে জবাবদিহি
নবীরা আল্লাহর বাণীর বাহক, আর আমরা সেই রবেরই আবদিহি।